প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৯
editorial@prothom-alo.info

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ■ ধরিত্রী সরকার

বড় ভূমিকম্পের আশঙ্কা ও আমাদের করণীয়

২১ সেপ্টেম্বর রাতে কেঁপে উঠেছিল রাজধানী ঢাকার সব উঁচু ইমারত। এর কয়েক ঘণ্টা আগে ওই দিনই বিকেলে আরেকটি মৃদু ভূমিকম্প হয়েছে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী রাতের ভূমিকম্পটি ছিল রিখটার স্কেলে ৫.৪ মাত্রার এবং যার উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকা থেকে ৫৫২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মিয়ানমারের কোনো এলাকায়। ২১ সেপ্টেম্বর বিকেলে চীন-ভুটান সীমান্তে আঘাত হানা ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে ৬.৪। ওই ভূমিকম্পে ভুটানে কমপক্ষে ১১ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

এর আগে গত মাসে ১০ আগস্ট রাতেও বাংলাদেশে মৃদু ভূমিকম্প হয়েছে। রিখটার স্কেলে সে ভূমিকম্পে ঢাকা ও চট্টগ্রামে কম্পনের মাত্রা ছিল যথাক্রমে ৩ ও ৪।

বড় ভূমিকম্পের পূর্বাভাস হিসেবে ছোট ও মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পের দেখা মেলে। পর পর দুই মাসে তিনটি ভূমিকম্প কি আমাদের সেই কথায় মনে করিয়ে দিচ্ছে?

এবারের ভূমিকম্পের পর ঢাকাবাসী কিছুটা আঁচ করতে পেরেছে যে আমরা বড় একটা ঝুঁকির মধ্যে আছি। মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পে আমরা যতটা ভীত হয়েছি, তাতে বড় ধরনের ভূমিকম্প সৃষ্টি হলে ঢাকায় বিপর্যয়ের পরিমাণ কতটা হবে তা নিয়ে অনেকেই আতঙ্কিত হয়েছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত সে ধরনের বিপর্যয় মোকাবিলায় আমাদের প্রস্তুতি নগণ্য, জনসচেতনতাও প্রায় নেই বললেই চলে। এ কথা সত্য, বাংলাদেশ ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় রয়েছে এবং যেকোনো সময় বড় ধরনের ভূমিকম্পে বাংলাদেশের কোনো অঞ্চল বিধ্বস্ত হতে পারে। আমরা যদি এখন থেকে সতর্কতা অবলম্বন না করি বা সুউচ্চ ভবন সঠিক ক্যারিগরি নিয়ম মেনে নির্মাণ না করি, তাহলে যেকোনো দিন বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পড়ার আশঙ্কা থাকবে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী, সাধারণত রিখটার স্কেলে ৫ থেকে ৫ দশমিক ৯৯ মাত্রার ভূমিকম্পকে মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প বলা হয়। ৬ থেকে ৬ দশমিক ৯৯ মাত্রাকে তীব্র, ৭ থেকে ৭ দশমিক ৯৯ মাত্রাকে ভয়াবহ এবং এর ওপরের মাত্রাকে অতি ভয়াবহ ভূমিকম্প বলা হয়। সে হিসাবে ঢাকা মহানগরে একটি বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটানোর জন্য একটি উচ্চমাত্রার ভূমিকম্পই যথেষ্ট। কারণ, এযাবৎ রাজউক থেকে যেসব বাড়ির নকশা অনুমোদন নেওয়া হয়েছে, তার প্রায় সবই রিখটার স্কেলে ৫ মাত্রার কিছু বেশি ভূকম্পন সহ্য করতে পারে। উপরন্তু কোনো কোনো বাড়ির মালিক নির্ধারিত মাত্রার ভূকম্পন প্রতিরোধক বাড়ির নকশা পাস করিয়ে বাড়ি নির্মাণের সময় তা আর মানেননি। ৭ মাত্রারি রিখটার স্কেল বজায় রাখা হয়েছে—এমন নমুনা খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় ভূমিকম্পটি হয়েছিল ১৮৯৭ সালে। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও আসাম এলাকায় সংঘটিত এ ভূমিকম্পের রিখটার স্কেলে মাত্রা ছিল ৮ দশমিক ১। সে ভূমিকম্পে ময়মনসিংহ, রংপুর, ঢাকাসহ অনেক এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। ঢাকায় সে সময়ের ইটের তৈরি প্রায় সব ভবনই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন, এ ধরনের বড় ভূমিকম্প ১০০ থেকে ১৩০ বছরে একই এলাকায় আবার আঘাত হানতে পারে। সে হিসাবে নিকট-ভবিষ্যতে ঢাকায় একটি বিপর্যয়কর ভূমিকম্পের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

অতীতে সংঘটিত ভূমিকম্পগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, ১৮৯৭ সালের ৮ দশমিক ১ মাত্রার ভূমিকম্পটি ঘটেছিল ঢাকা, ময়মনসিংহ, রংপুরসহ দেশের অনেক অঞ্চলে, যার উৎপত্তি হয়েছিল সিলেটের ডাউকি ফল্ট থেকে। ১৯১৮ সালে সিলেটের শাহজিবাজার ফল্ট সিস্টেম থেকে ৭ দশমিক ৬ মাত্রার একটি ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়ে আঘাত হেনেছিল শাহজিবাজারসহ সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আরও কিছু ঝুঁকিপ্রবণ ভূমিকম্পের উৎপত্তি-এলাকা বা ফল্ট সিস্টেম সম্পর্কে আমরা অবগত আছি। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জরিপে দেখা গেছে, দেশের ছয়টি এলাকায় মাটির নিচে বড় ধরনের ফাটল বা চ্যুতি রয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত এলাকার ডাউকি নদীর পাশে সিলেট ও মেঘালয় এলাকার মাটির নিচের ফাটলটি সবচেয়ে বড়। প্রায় ১০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এ ফাটলের কারণে রংপুর, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, মৌলভীবাজার এলাকা ঝুঁকির মধ্যে আছে। টাঙ্গাইলের মধুপুর এলাকায় একটি ফাটল বা ফল্ট সিস্টেম রয়েছে, যার কারণে ঢাকা বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এ ছাড়া চট্টগ্রাম ফল্ট সিস্টেম, টেকনাফ ফল্ট সিস্টেম, ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট ফল্ট সিস্টেম এবং রাজশাহীর তানোর ফল্ট সিস্টেম থেকে যেকোনো সময় মাঝারি বা বড় আকারের ভূমিকম্প উৎপত্তি হওয়ার ঝুঁকি থাকেই। উৎপত্তিস্থলের কাছাকাছি ক্ষতির আশঙ্কা সব সময় বেশি হলেও সেটি কত দূর ছড়াবে, তা কম্পনের তীব্রতা ও মাটির গঠনের ওপর নির্ভর করবে।

বাংলাদেশের অবস্থান একটি ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় হওয়ায় আমরা সব সময় সে ঝুঁকির মধ্যেই আছি। তবে গ্রামীণ এলাকায় বহুতল ভবনসহ অন্যান্য অবকাঠামো কম হওয়ায় ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা কিছুটা কম। কিন্তু ঢাকাসহ বড় শহরগুলোতে ক্ষতির আশঙ্কা খুবই বেশি। ঢাকায় অসংখ্য ভবন তৈরি হয়েছে কোনো ধরনের ভূমিকম্প-প্রতিরোধক ডিজাইন ছাড়াই। অধিকসংখ্যক মানুষের বসবাসের জায়গা তৈরি করতে গিয়ে খাল, বিল, নালাসহ নিচু ভূমি ভরাট করা, মাটিকে কোনো রকম জমাট বাঁধার সময় না দিয়ে যেসব ইমারত নির্মাণ করা হচ্ছে, সেগুলো ভূমিকম্পের আঘাতে ভেঙে পড়ার আশঙ্কা খুবই বেশি। দুর্বল ভিত্তি ভূমির মধ্য দিয়ে ভূমিকম্পের তীব্রতা পরিব্যাহিত হয় খুব তাড়াতাড়ি। এসব জানা সত্ত্বেও খোদ রাজউকই পূর্বাচল ও উত্তরা তৃতীয় প্রকল্পে জনগণের জন্য প্লট তৈরি করছে নিচু ভূমি ভরাট করে। মাত্রাতিরিক্ত নগরায়ণ-প্রবণতার কারণে অনেক নিচু জমিতে বহুতল ভবন নির্মিত হচ্ছে সঠিক পাইলিং ছাড়াই, যা ভূমিকম্পের ঝুঁকির মধ্যে থাকবে সব সময়।

১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ সরকারের ইমারত নির্মাণ বিধিমালা বা বিল্ডিং কোড তৈরি হয়েছে, যা অনুসরণ করে ইমারত নির্মাণ হওয়ার কথা। কিন্তু ঢাকা শহরের নির্মাণে অনেক ক্ষেত্রেই যে তা মানা হয়নি, তা অনেক কর্তৃপক্ষেরই জানা। ফলে এসব বিল্ডিং ভূমিকম্পে ধসে অজস্র মানুষের প্রাণহানির আশঙ্কা থাকেই।

ভূমিকম্প আঘাত হানলে পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাসের মতো অত্যাবশ্যকীয় ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয়। গ্যাস ও বিদ্যুতের লাইন থেকে অনেক ক্ষেত্রেই আগুন ধরে, যা অনেক ক্ষতির কারণ হয়। পানি ও পয়োলাইনগুলো বিধ্বস্ত হয়ে অপরিষ্কার পানির আগ্রাসনে চরম স্বাস্থ্যঝুঁকির সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ ধরনের হুমকির মুখে আমাদের প্রস্তুতি কী? বলতে গেলে তেমন কিছুই নেই। মনে রাখা দরকার, যেকোনো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেই দুর্যোগ-পরবর্তী ব্যবস্থাপনার চেয়ে দুর্যোগপূর্ব প্রস্তুতি অনেক বেশি কার্যকর। তবে মনে রাখা দরকার, অন্যান্য দুর্যোগের মতো ভূমিকম্পের পূর্বাভাস আগে পাওয়ার তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই। জানা যেতে পারে মাত্র কয়েক সেকেন্ড বা মিনিট খানেক আগে। সে কারণে ভূমিকম্পের ঝুঁকির প্রাকপ্রস্তুতিও নিতে হয় অনেক আগে থেকেই।

আমাদের প্রধান ঝুঁকি হলো রাজধানী ঢাকা। মানুষ বাড়ছে হু হু করে। ঢাকা শহরে এমন অনেক অঞ্চল রয়েছে, যেখানে অনেক বহুতল ভবন রয়েছে। কিন্তু সেখানে একটি অ্যাম্বুলেন্স ঢোকার ব্যবস্থাও নেই। জলাভূমি, খাল, নদী-নালা, ডোবা ভরাট করে বাড়িঘর বানানো হয়েছে। এক জরিপে দেখা গেছে, ঢাকা মহানগরের ৬০ শতাংশ বাড়িই দুর্বল মাটির ওপর তৈরি। হাউজিং কোম্পানিগুলো কোনোরকমে নিচু ভূমি ভরাট করে প্লট বিক্রি করছে বা বহুতল ভবন তৈরি করে ফেলছে। মাটিতে ঠিকমতো গাঁথুনি দেওয়া হচ্ছে না, ঠিকমতো পাইলিংও করা হচ্ছে না। নরম মাটির মধ্য দিয়ে ভূকম্পনের অগ্রসর হওয়ার তীব্রতা অনেক বেশি। বিল্ডিং কোড মেনে ভূমিকম্প-প্রতিরোধী করে তৈরি করা না হলে, ঢাকার ভবনগুলো ভূমিকম্প-ঝুঁকির মধ্যে ডুবে থাকবে সব সময়।

ঢাকা ও অন্যান্য শহরে জরাজীর্ণ ও পুরোনো বাড়ির সংখ্যা অনেক হওয়ায় এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নীতিমালা মেনে না চলায় বড় ধরনের ভূমিকম্পে ঢাকাসহ দেশের বড় শহরগুলোতে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সাধিত হতে পারে। উদ্ধারকাজের মেশিন ও যন্ত্রপাতির তেমন মজুদ নেই। অনেক হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবন ঝুঁকিপূর্ণ। ভূমিকম্প হলে কী করতে হবে, সে বিষয়ে জনসচেতনতাও নেই। কিন্তু ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতির মোকাবিলায় সচেতনতা একটি বড় বিষয়। বলা যায়, একটি বড় ধরনের ভূমিকম্প মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি নিতে গেলে আমাদের প্রায় শুরু থেকে শুরু করতে হবে। ভূমিকম্পের সময় কী করতে হবে এবং কী করা যাবে না, তা মানুষকে জানাতে হবে। বাংলাদেশে এখন সংবাদপত্রের সংখ্যা বেড়েছে। ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমের সংখ্যাও বেড়েছে। দুর্যোগ-পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করতে গণমাধ্যম এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। মানুষের মধ্যে এতটুকু চিন্তা ঢোকাতে হবে যে তার সারা জীবনের সঞ্চয়ে গড়ে তোলা বাড়ি ও জীবন এক মুহূর্তের একটি ভূমিকম্পে নষ্ট হয়ে যেতে পারে সামান্য নিয়ম না জানা, কার্পণ্য ও অসচেতনতার ফলে।

ভূমিকম্পসহনশীল ভবন নির্মাণ করলে সে ভবনে বসে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু থাকে না। তবে ভূমিকম্প-ঝুঁকির কথা চিন্তা না করে দেশে যে শত-সহস্র ভবন নির্মিত হয়েছে, সেগুলোর ঝুঁকি মারাত্মক। সে কারণে, ভূমিকম্পের সময়ে জীবন রক্ষার জন্য অর্থাৎ নিজেকে বাঁচানোর জন্য যেসব পদক্ষেপ নেওয়া যায়, সে বিষয়ে সাধারণত মানুষকে জানানো বা তাদের সচেতন করে তোলা খুবই জরুরি। সরকার ও গণমাধ্যমগুলো জনগণকে সচেতন করার সে দায়িত্বটুকু কাঁধে নিলে মানুষ অনেক উপকৃত হবে।

● ধরিত্রী সরকার : বিজ্ঞান ও পরিবেশ বিষয়ের লেখক।